শস্য সুরক্ষা

আমরা একত্র আজ শস্য সুরক্ষায়

প্রথম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

যুগ্ম সম্পাদক:
মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী

মুখ্য উপদেষ্টা : চিত্রেশ্বর সেন

সচিব : শান্তনু ঝা

অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্লান্ট প্রটেক্সন (এএপিপি)
প্লান্ট প্রটেক্সন ইউনিট, বি.সি.কে.ভি
মোহনপুর, নদীয়া-৭৪১২৫২

SASHYA SURAKSHA
Jan. - Feb. issue, 2007
Quarterly Bulletin of Association for Advancement in
Plant Protection (AAPP)
Plant Protection Unit, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya
Mohanpur, Nadia, 741235

Published by SHANTANU JHA

প্রকাশ

মাঘ - ফাল্গুন - ১৪১৩

জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

সম্পাদক ঃ মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী

প্রচ্ছদ ও আলংকরণ ঃ শঙ্কর ধর

প্রকাশক

শান্তনু ঝা, সচিব

এ্যাসোশিয়েশন ফর অ্যাড্ভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রোটেক্শন, প্লান্ট প্রোটেক্শন ইউনিট, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া, ৭৪১২৩৫

মুদ্রক

কৌশিক দত্ত, লেসার এইড প্রিন্টার্স, বি-৯/১০৭, কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫
মোবাইল - ৯৩৩০৮৭৩৮০৮

পরিবেশক

এ.এ.পি.পি., প্লান্ট প্রোটেক্শন ইউনিট, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর

দাম ঃ ১০ টাকা।

সম্পাদকমন্ডলী

যুগ্ম সম্পাদক মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী
সচিব শান্তনু ঝা
মুখ্য উপদেষ্টা চিত্রেশ্বর সেন

সদস্য বৃন্দ অমর কুমার সোমচৌধুরি
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রতিকান্ত ঘোষ
শ্রীকান্ত দাস
পার্থসারথী নাথ
মতিয়ার রহমান খান
সুজিত কুমার রায়

সূচীপত্র

দু-চার কথা ঃ ৩

গ্রীষ্মের সজ্জির রোগ পোকা ও সমাধান
- বেগুন ঃ ৪
- লাউ-কুমড়ো ঃ ৬
- নটে শাক ঃ ৯
- পটল ঃ ৯
- ওল ঃ ৯

ফুলের পোকা-মাকড় ও সমাধান
- জিনিয়া ঃ ১১
- দোপাটি ঃ ১২
- রজনীগন্ধা ঃ ১২

লাল সংকেত - আলু ঃ ১৪

শস্য সুরক্ষার প্রযুক্তি ঃ চাষী নিচ্ছেন কতটা ঃ ১৪

দু-চার কথা

সহনশীল ভ্যারাইটির চাষ করে রোগপোকার নিয়ন্ত্রণ আজও নিশ্চিন্তে করা যায়। সংকরায়ণের প্রযুক্তিতে একই ফসলের অথবা ভিন্ন প্রজাতির (কিন্তু একই পরিবারভুক্ত গাছ) সহনশীলতা জিন ঢোকানো হয় বলে ফসল-দেহে কোন 'বিরূপতা' প্রায় আসেই না। আমাদের দেশের কৃষি গবেষণায় তাই সংকরায়ন করে প্রতিরোধী ভ্যারাইটি সৃষ্টির কাজ সাফল্যের সাথেই চলছে। ধানের ক্ষেত্রে 'গলমাছির' প্রতিরোধী জিন জি এম-১ ও ২ ব্যবহার হচ্ছে। ব্যাক্টিরিয়াজনিত ঝলসা রোগ প্রতিরোধী তিনটি জিন এক্স -এ ২১, ১৩ ও ৫ পাওয়া গেছে দেশীয় সম্বা মাসুরি ও ত্রিগুনা ভ্যারাইটি থেকে। গমের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে বাদামি মর্চে রোগের জন্য এল. আর - ১০, ১৩, ২৩, ২৬ প্রভৃতি, কালো মর্চের জন্য এস আর -২, ৯, ১১, ৩১ প্রভৃতি এবং হলুদ মর্চের জন্য ওয়াই আর ২, ৯। অন্ধ্রতে ছোলার ঢলা রোগ প্রতিরোধী ভ্যারাইটি আই সি সি ভি-২ ও জে জি-১১ ব্যবহার হচ্ছে। কলাই এর তুলোরোগ (ডাউনি মিলডিউ) সহনশীল ভ্যারাইটি পাওয়া গেছে - এল বি জি -১৭, ৪০২ ও ৬১১। ফলে কলাই চাষ বেড়েছে। পঞ্জাব, উ. প্রদেশ, হরিয়ানাতে গম কাটার পর মুগের 'হলুদ ছোপ রোগ' প্রতিরোধী পুসা বিশাল, সম্রাট, পন্থ মুগ-৫ চাষ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। অড়হড়ের 'ঢলারোগ' প্রতিরোধী সংকর ভ্যারাইটি জি টি এইচ -১ গুজরাটে ২৫ % ফলন বাড়িয়েছে। আলুর টি পি এস সংকর ভ্যারাইটি - টি পি এস সি-৩, এইচ-পি এস-১১৩ বা ৯২, পি টি -২৭ এর চাষে অনেক কম রোগ পোকা লেগেছে।

তাই রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের কৃষি এই ধরনের ভ্যারাইটি নির্বাচন করে যদি হয় তবে চাষের খরচ কমিয়ে ফলন বাড়ানো সম্ভব। সব সহনশীল ভ্যারাইটি সব জায়গাতে সব চাষীর প্রয়োজন মেটাতে পারে না প্রায়ই। তবু উদ্যোগ জারি রাখতে পারলে, রোগ-পোকা সহনশীল ভ্যারাইটির বীজ নিয়মিত সংগ্রহ করা, চাষীর পছন্দের ভ্যারাইটির পাশাপাশি চাষ করা এবং নির্বাচনটা চাষীদের দিয়েই করানো চালিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। এতে চাষের খরচ কমা ছাড়া পরিবেশ কম দূষিত হবে। ওষুধ স্প্রে করার ঝামেলা -ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

নীলাংশু মুখার্জী
মনোজ রঞ্জন ঘোষ
সম্পাদক

○ বেগুনের রোগপোকার সুসমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

ভারত সরকারের প্লান্ট প্রটেকশন ও কোয়ারান্টাইন ডাইরেক্টরেট, ফরিদাবাদের সুপারিশ অনুযায়ী বেগুনের ক্ষেতের পরিস্থিতির প্রাথমিক পরিচয় প্রশিক্ষিত কৃষককে অ্যাগ্রোইকোসিস্টেম বিশ্লেষণের (আয়েসা) মাধ্যমে জেনে নিতে হবে। মাঠে কৃষকরা নিয়মিত যাতায়াত ও ঘোরার অভ্যাস রাখলে রোগপোকার আগমন-বার্তা একটু পেয়ে যাবেন।

মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, চাষ দিয়ে একটু ভিজিয়ে দিন সাতেক অন্তত বীজতলাটা ৬০-১৬০ গজের স্বচ্ছ পলিথিনে দিন ৫-৭ ঢেকে মাটির কিছু পোকা জীবাণু কমিয়ে নেওয়া যায়। বেগুনের আগে এবং পরে যথাক্রমে ফরাস বীন ও গম চাষ করলে বাক্টিরিয়াজনিত ঢলা এবং কৃমিজনিত শিকড়ফোলা কমবে। ডগা ও ফল ছিদ্রকারি পোকার কিছুটা সহনশীল ভ্যারাইটি পাঞ্জাব বর্ষাতি, পরাঞ্জাব মিতাম, পুসাপার্পল রাউন্ড ও এস বি ১৭-৪ আছে। অন্য যেসব পোকা পাতায় ডিম পেড়েছে বা ছোট লার্ভা এখনও জড় হয়ে আছে তা তুলে জুতোর তলায় পিষে মেরে ফেলা, আক্রান্ত ডগা ও ছিদ্র করা ফল তুলে লার্ভাসহ নষ্ট করতে হবে। মাঠে হলুদ পাত্রে (হেক্টরে ১০টা) কেরোসিন জলে সাদামাছি ও থ্রিপস ধ্বংস করতে হবে। মাঠে এদের সংখ্যা কমবে এভাবে। মাঠের আলে বরবটি লাগালে এসব পোকার প্রাকৃতিক শত্রু (বন্ধুপোকা) সংখ্যা বাড়বে। হেক্টরে ৫০টা পাখিবসার বাঁশ লাগাতে হবে। মাঠে সেচ দেবার জলে হেক্টরে ১৫ কেজি ব্লিচিং পাউডার মেশাতে হবে বাক্টিরিয়াজনিত ঢলা কমানোর জন্য। বীজতলা করতে হবে ভালো নিকাশি যুক্ত মাঠে। তাতে গোড়াপচা বা চারা ধ্বসা কম হবে। মাঠে উই-এর উপদ্রব থাকলে মাটিতে হেক্টরে ৫০০ গ্রাম এ আই ক্লোরোপাইরিফস প্রয়োগ করতে হবে। বীজতলাতে প্রতি বর্গমিটারে ০.৩-০.৬ গ্রাম কার্বোফুরান ৩ জি প্রয়োগ করা দরকার, জমিতে হেক্টরে ২০০ কেজি নিমখোল প্রয়োগ করতে হবে। সেসব সত্ত্বেও ফল ও ডগাছিদ্রকারি পোকা লাগলে হেক্টরে ৫২৫ গ্রা এ.আই এন্ডোসালফান স্প্রে করতে হবে। তবে ট্রাইকোগ্রামা চিলোনিস হেক্টরে ৫০ হাজার ছাড়তে পারলেও এই পোকা নিয়ন্ত্রণ হবে। জাবপোকা, মাকড় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে ক্রাইসোপেরলার প্রতিগাছে দুটি করে গ্রাব ছাড়তে হবে।

সূত্র ঃ ডাইরেক্টরেট অফ প্লান্ট প্রটেক্সন, কোয়ারান্টাইন অ্যান্ড স্টোরেজ, ফরিদাবাদ, আই পি এম প্যাকেজ নম্বর -২২

● বেগুনের পোকা-মাকড় ঃ

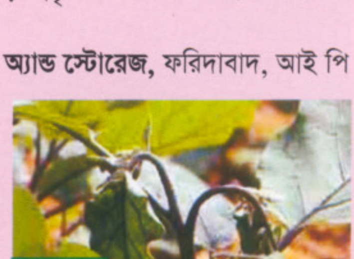

ডাঁটাও ফল ছিদ্রকারি পোকা আক্রান্ত

চারা অবস্থা থেকে মরশুমের শেষ পর্যন্ত বেগুনের ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারি পোকা বিশেষ সমস্যা। এই পোকার ধাড়ি বা মথ সন্ধ্যার অন্ধকারে শাখার ডগাতে রোমের মধ্যে বা ফলের বৃতির নীচে একটি করে সাদা ডিম পেড়ে দেয়। ডিম থেকে কীড়া বেরিয়ে ডগা বা ফলের নরম অংশে ছেঁদা করে ভেতরে ঢোকে এবং খেতে থাকে। ১৫-২০ দিনে বড়, গোলাপি-সাদা এক আঙ্গুল লম্বা কীড়া হয়। ডাঁটা বা বেগুনের গায়ে একটা গোলাকার ছেঁদা তৈরি করে তার মধ্যেই পুত্তলীতে পরিণত। এরপর ৭-১০ দিনে মথ হয়ে ঐ ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে নতুন

বেগুনের পাতামোড়া পোকা

জীবন শুরু করে। এভাবে ৪-৫ মাসের ফসলে ছয়টি প্রজন্ম সৃষ্টি করে যার তৃতীয় প্রজন্ম থেকে ক্ষতি বাড়ে। পোকার কীড়া গাছের ডগার বা ফলের ভিতরে থাকে বলে এর নিয়ন্ত্রন করা কঠিন। তবে কিছু ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষতির মাত্রা কমানো যায়।

১। চারা রোপনের ৩-৪ সপ্তাহ পরে চারা লেগে গেলে চারাপ্রতি ১ চামচ ফুরাডান দানা মাটিতে গোড়ার চারপাশে দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা কিছুকাল সুস্থ থাকে। ২। আক্রান্ত ডগা ও ফল কীড়াসহ তুলে জলে ডুবিয়ে কীড়া মেরে ফেলতে হবে। তার পরে নিমঘটিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ৪। গাছে ফুল আসার পর কোন রাসায়নিক ওষুধ দেওয়া চলবে না।

বেগুনের আর এক সমস্যা পাতামোড়া পোকা। ফসলের মাঝবয়সে ডগায় ছোটপাতা মুড়ে ফেলা বা শিরা বরাবর বা ধার থেকে মুড়ে ফেলা পাতা দেখা যায়। মোড়াপাতা বা ডগা খুললে ভিতরে বড়-ছোট নানা মাপের কীড়া দেখা যাবে। গাঢ় বাদামিতে আড়াআড়ি সাদা দাগযুক্ত সুক্ষ্ম রোমশকীড়া। খুব বেশি আক্রমণ না হলেও ডগায় আক্রমণ বেশ ক্ষতিকর। আক্রান্ত অংশ কীড়াসহ নষ্ট করে ফেলতে হবে। পরে নিমঘটিত কীটনাশক স্প্রে।

জাব পোকা

বেগুনের জাবপোকা লাউকুমড়োর জাবপোকা একই। গাছে বাড়ন্ত ডগায় বা নরম পাতার তলার পিঠে ঝাঁক বেঁধে রস শোষণ করে। ফলে ডগার বাড় কমে যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। এদের বর্জনে যথেষ্ট চিনি (হানি ডিউ) থাকে যা নীচের পাতায় পড়ে। তার ওপর কালো ভুসো ছত্রাক আস্তরণ তৈরি করে। গাছের সালোক সংশ্লেষ কমে যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

জাল -ডানা (লেসউইঙ্গ বাগ) শোষক পোকা পাতার ওপর বা নিচের পিঠে প্রায়ই দল বেঁধে লাগে। ছোট (৩ মি.মি) ধূসর পোকার রস শুষে খায়। পাতা বিবর্ণ হয় এবং ঝরে পড়ে দ্বয়ে পোকা ফসলের শেষ পর্যায়ে আসে। বাড়ন্ত কান্ডে ও পাতার গায়ে গায়ে লেগে থাকে। এদের গা থেকে বেরোন সাদা মোমের গুঁড়া আস্তরণ সবটা ঢেকে রাখে। এদের শোষণের ফলে পাতার উপর পিঠ স্থানে স্থানে হলুদ হয়। আক্রান্ত পাতা ঝরেও যায়। এ পোকাও মধুমল ত্যাগ করে। নীচের পাতায় তার ওপর কালো ভুসোর মত ছত্রাক আবরণ তৈরি হয়।

এসব পোকা নিয়ন্ত্রণে ঃ ১। আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা, ২। পরের মরশুমে ফসল লাগানোর আগেই পুরানো গাছ তুলে সার গাদায় ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলা দরকার। ৩। দেখতে হবে এই পোকাগুলির সাথে কমলাতে কালো ডোরা বা ছিটদাগ গুবরে পোকা (বিটল) যথেষ্ট থাকলে কীটনাশক না দেওয়াই ভালো। ৪। এই বন্ধু পোকা যথেষ্ট না থাকলে মেটাসিসটকস লিটারে ১ মিলি গুলে স্প্রে করতে হবে।

● বেগুনের রোগ-ব্যাধি ঃ

ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ আসে ফুল-ফল ধরার সময়। আক্রান্ত গাছের ডগার পাতা দুপুরে ঝিমিয়ে পড়ে। জোর কমে যায়। তারপর গাছ শুকায়। আক্রান্ত গাছে গোড়াতে পচা না থাকলে

নখ দিয়ে খুঁটে বোঝা যায়) গাছ তুলে গোড়ার কাছের ছাল ও কাঠসহ কাটা টুকরোকে পরিস্কার জলে (কাঁচের গ্লাসে ৩-৪ চামচ) ডুবিয়ে আধঘন্টা পরে ঐ জলে ঘোলাটে চুনজলের মত হলে বুঝতে হবে রোগটি ব্যাক্টিরিয়াজনিত ঢলা। না হলে গোড়াপচা। শুধু উপরে ঢলে শুকালে, পাতায় দাগ হলে ও ফলে পচা ধরলে সেটি ডালশুকানো রোগ। এসব কিছু না হয়ে শুধু নতুন-বের-হওয়া পাতা গুচ্ছের মতো বার হয়ে জমাট বেঁধে আছে। গাছে বাড় বন্ধ। ফুল-ফলও ধরছেনা।

ব্যাক্টেরিয়া জনিত বেগুনের ঢলে পড়া রোগ

এমনটা হলে ফাইটোপ্লাজ্মা-জনিত তুলসীলাগা। চারা অবস্থায় গোড়াপচে চারাধ্বসা। চারা মরেও যেতে পারে। যে মাঠে ঢলা, বা গোড়াপচা অথবা চারাধ্বসা লাগছে তার কিছু পরিচর্যা দরকার। তবে ফসল তোলার পর। মাটি অম্ল হলে চূণ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। হালকা মাটি হলে যথেষ্ট জৈবসার দিতে হবে। সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা থাকলে আরো ভালো। ফসলচক্রে একই পরিবারের ফসল (টোমাটো, লঙ্কা, এসব) লাগানো যাবে না বেগুনের পর। গোড়াপচা হলে অবশ্য আক্রান্ত গাছের গোড়া পরিষ্কার করে, খুঁড়ে কার্বেনডাজিম ও অ্যালকিলিন ডায়থায়োকার্বামেটের মিশ্রণ (১ গ্রাম ও ২ গ্রাম প্রতি লিটার) প্রয়োগ করা দরকার। গাছপ্রতি ২০০-২৫০ মি. লি দিতে হবে।

ফাইটোপ্লাজ্মা জনিত তুলসী লাগা

ডাল শুকনো ও ফল পচার ক্ষেত্রে প্রথমমত রোগমুক্ত ফল সংগ্রহ করতে হবে। উজ্জ্বল চকচকে দেখতে লাগে এমন বীজ বুনতে হবে। থাইরাম (২.৫-৩ গ্রাম প্রতি কেজি) দিয়ে বীজ শোধন করে বীজ কেনা উচিত এরপরও যদি ডালশুকনো ও ফলপচার লক্ষণ জমিতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে আগে লেখা ফমোপসিস রোগের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

ছত্রাক জনিত ডাল শুকনো, গোড়াপচা ও ফল পচা

স্প্রে করার আগে আক্রান্ত ডাল, ফল ও পাতা সংগ্রহ করে সার গাদাতে ফেলে দিতে হবে। তুলসী লাগার ক্ষেত্রে নিয়মিত মাঠে নজরদারি রেখে প্রথমেই রোগটি চিহ্নিত করতে হবে। আক্রান্ত ১-২টা গাছ তুলে সার গাদায় ফেলে শিরাবাহি কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। রোগটি যেন বাহক পোকার (শোষক পোকা) দ্বারা সারা মাঠে ছড়িয়ে না পড়ে।

● লাউকুমড়োর পোকা-মাকড় ঃ

বাঘাপোকা বা এপিলাকনা বিটল শীতকালীন সবজি বা জমির আশপাশের বনবেগুন জাতীয় আগাছা থেকে আসে। মটর দানার মাপের হলদে-বাদামি পোকার পিঠে ষোল -আঠারোটি কালো ফোঁটা দাগ থাকে। এই পোকার ধাড়ি ও কীড়া পাতার উপর পিঠে কুরে খায়। আতস কাঁচে এই কুরে খাওয়াটা সবুজ-সাদা ঢেউ খেলানোর মত দেখা যায়। হালকা-হলুদ পটলের আকৃতির ছোট

(সিকি ইঞ্চি) কাঁটাওলা কীড়া দেখা যায়। মাঝারি বয়সের পাতাতেই বেশি আক্রমণ হয়। চারা লাগানোর তিন সপ্তাহ থেকে ধাড়ি পোকা দেখা দেয়। ধাড়ি পাতার উপর বা নীচে দু-মি মি লম্বা, মাকুর মত ডিম খাড়া-গোছায় পেড়ে দেয়। চার-পাঁচ দিনে ডিম থেকে কীড়া বেরিয়ে পাতা খাওয়া সুরু হবে। ১৫-২০ দিন পরে প্রথমে হলুদ ও পরে বাদামি পুত্তলি হয়ে যায়। ৭-১০ দিন পরে ধাড়ি হয়ে বেরিয়ে যায়।

এপিলাকনা বিটল

ছোট মাঠে হাত দিয়ে পোকা ধরা বা জাল দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ধরে মেরে ফেলতে হবে। প্রথমদিকেই করতে হবে। তাতে আক্রমণ ছড়ায় না। ডিমের গোছা কীড়া বা পুত্তলিও আঙুলে টিপে মেরে ফেলতে হবে। পরে এন্ডোসালফান ভালো নজল-স্প্রেয়ারে সুক্ষ্ম কণা করে স্প্রে করতে হবে। তবে এটা ফল ধরার আগে পর্যন্ত করা যাবে। ফল হলে ম্যালথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

লাল বিটল

লাল বিটল লাগলে ফুল আসার সময় সিকি ইঞ্চি লম্বা চকচকে হলদে-লাল বা কালো গুবরে পোকা দেখা যায়। ধাড়ি এবং কীড়া -দুইই ক্ষতি করে। কীড়া দেখা যায় না। কারণ ধাড়ি স্ত্রী গাছের গোড়াতে বা গাঁটে একটি করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বেরিয়ে ভিতরে ঢুকে কুরে খায়। মাটির ভিতরে গোড়া বা মাটিতে লেগে থাকা গাঁট ফুলে যায়। ধাড়ি পোকা পাতা কুরে খায় আর ফুলে ঝাঁক বেঁধে থাকে। পাপড়ি খেয়েও যথেষ্ট ক্ষতি করে। জাল ঘুরিয়ে ধাড়ি পোকা ধরে মেরে ফেলাই ভালো উপায়।

ফলের মাছি - মাছির আকারের হলুদ পোকা ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় বাকলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে সাদা, ছুঁচাল মাথা, পা হীন কীড়া (কৃমির মত) ফলের নরম শাঁস খায়। ফলে পাকার আগে কুমড়ো বা লাউ হলুদ হয়ে যায়, পচতে থাকে এবং অল্প চাপে ফেটে গিয়ে পচা-গলা শাঁস বেরিয়ে পড়ে। ২০-২৫ দিন পরে ফলের গায়ে ছেঁদা করে কীড়া বেরিয়ে আসে, মাটিতে পড়ে ভিতরে ঢুকে পুত্তলী হয়। ৯-১২ দিন পরে ধাড়ি হয়ে বেরিয়ে এসে আবার ফলের গায়ে ডিম পাড়ে।

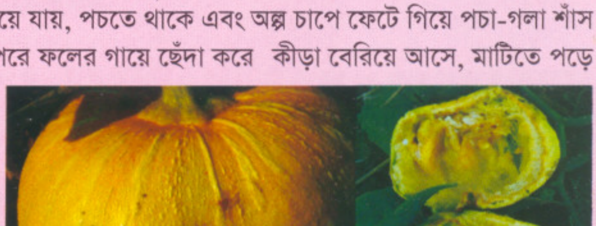
মাছি আক্রান্ত ফলের ছিদ্র ও ফল পচা

প্রতিরোধের জন্য ফল থেকে কীড়া বের হবার আগেই ফলশুদ্ধ নষ্ট করে ফেলতে হবে। মাছিকে ফলে ডিম পাড়ার আগেই ফাঁদে ধরতে হবে। ঝোলা গুড় (৯৫%) ও ম্যালাথিয়নের (৫%) মিশ্রণ কাপড়ের পর্দায় মাখিয়ে বা মাটির সরাতে করে মাঠে রাখতে হবে। ওতে মাছি মরবে। তাল বা খেজুর রসের তাড়িও ব্যবহার করা যায়। এসব আক্রান্ত লাউ-কুমড়ো সার গাদায় না ফেলে জলে ডুবিয়ে কীড়া মেরে ফেললে মাছির

প্রকোপ কমবে। এসবের জন্য ক্ষেতে নিয়মিত নজরদারি রাখতেই হবে। উচ্ছে এবং পটলেও এই মাছির ক্ষতিকর আক্রমণ হয়।

● লাউকুমড়োর রোগ-ব্যাধি ঃ

মোজেইক বা কুটে রোগে

মোজেইক বা কুটে রোগে লাউকুমড়ো জাতের সবজির বেশ ক্ষতি হয়। আক্রান্ত লতার প্রথম পাতা ও ডগাতে শিরা মধ্যবর্তী অংশ সরু দাগ ধরে। পরে মোটা হয়ে শিরা উপশিরার দুপাশে সবুজ পাড়ের মত দেখায়। রঙ প্রথমে সবুজ ও হলুদ ছোপে মেশানো। ঐ ডগা যত বাড়ে তত বেশি হলুদ ও বিকৃত হতে থাকে। পাতা ছোট হতে থাকে। পরে আর বাড়ে না। আক্রান্ত লতায় ফুল আসেনা। ফল থাকলেও তা বাড়ে না। ভাইরাসজনিত এই রোগ লাউকুমড়ো ছাড়া ঝিঙা, উচ্ছে, শষা, ঘেরেকিনেও মারাত্মক আকারে হতে পারে। নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করা ছাড়া বড় মাঠে দু একটা লতাতে মাত্র রোগ দেখা গেলে সেই লতা তুলে ফেলে শিরাবাহি কীটনাশক প্রয়োগ করলে রোগ নাও ছড়াতে পারে। প্রতি লিটারে ১.৫ মি লি রোগর স্প্রে করা যায়।

কৃমিজনিত শিকড়ফোলা

অনেক সময় লতা খানিকটা বাড়ার পর আর বাড়তে চায় না। একটা ঝিমানো ভাব। সার দিলেও পাল্টায় না। এমন গাছ গোড়াশুদ্ধ তুলে যদি দেখা যায় গোড়া ফুলে গোদা হয়েছে এবং শিকড়ে ডুমো ডুমো ফোলা তবে তা কৃমির আক্রমন জনিত। সাধারণভাবে এসব জমিতে জৈবসার দেওয়া, ফসলচক্রে তন্ডুলজাতীয় শস্যের চাষ করা মাটি গ্রীষ্মকালে চষে রোদ খাওয়ানো এবং জৈব সারের সাথে ট্রাইকোডার্মা দেওয়া যেতে পারে। জমির এসব পরিচর্যা কয়েক বছর করা গেলে মাঠে এ রোগের প্রকোপ কমবে।

লাউ গাছের তুলারোগ বা ডাউনিমিলডিউ

কুমড়ো , ঝিঙা, শষা, উচ্ছে প্রভৃতি ফসলে হঠাৎ পাতায় হলদে-ফেকাসে ছিটদাগ দেখা যায়। এগুলি বড় হয়ে ছড়ায়ও। ঐ দাগের জায়গায় পাতার নীচের পিঠে সাদা তুলোর মত ছত্রাক গজায়। রোগটি তুলারোগ বা ডাউনি মিলডিউ। পাতায় প্রসারিত হলে পাতা ঝলসে যায়। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। নিয়মিত মাঠে নজরদারি থাকলে রোগ প্রথম অবস্থাতেই ধরা পড়বে। তখনই কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ওষুধ লিটারে ৩ গ্রাম হিসাবে গুলে স্প্রে করতে হবে। সাইমক্সালিন লিটারে ২ গ্রাম বা মেটালাক্সিল-মানকোজেব লিটারে ২ গ্রাম গুলেও স্প্রে করা যায়। যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্ম আসার আগে রাতে ঠান্ডা থাকে সেখানে লাউ-কুমড়ো জাতীয় ফসলের পাতার উপর পিঠে ছোট ছোট সাদা গুঁড়ো মাখানো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো যত বড় হয় তত অস্পষ্ট ও হালকা হয়। পাতার ঐ অংশ ফ্যাকাসে হলুদ রঙের হয়ে পরে ঝলসে যায়। এটি সাদা গুঁড়া বা পাউডারি মিলডিউ রোগ। প্রথম এ রোগ দেখা গেলেই ট্রাইডেমরফ্ লিটারে ১ মিলি বা

সাদাগুঁড়া বা পাউডারি মিলডিউ রোগ

ট্রায়ডিমেফন ১ গ্রাম হিসাবে গুলে স্প্রে করতে হবে।

● নটে জাতীয় শাকের রোগ পোকা ঃ

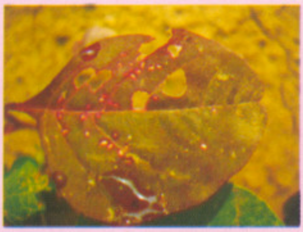

রোগ ও পোকা আক্রান্ত নটে পাতা

লালশাক, কাটোয়া ডাঁটা ইত্যাদি নটে গোষ্ঠীর নানা শাক ফসলে ও চাষ হয় গ্রীষ্মে। এদের পাতায় ক্ষুদে গুবরে পোকা লাগে, ছোট ছোট গোলাকার ফুটো করে দেয়। লাগে পাতা ও ডগামোড়ানো কীড়া ও। কান্ড ছিদ্রকারি কেড়ি পোকাও লাগে, তবে তেমন নয়। ক্ষতিও খুব একটা হয় না। গুবরের ছিদ্র করা পাতা বাজারে বিক্রি হয় না। তবে এসব পোকা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। তবু দরকার হলে মালাথায়ন -৫০ লিটারে ৫ গ্রাম হিসেবে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

এসব শাকে শীতগ্রীষ্মের মাঝামাঝি হলে (জলদি) **সাদা মরচে রোগ** দেখা যায়। জীবাণু ছত্রাকের আক্রমনে পাতার তলার পিঠে সাদা বা ঘিয়ে রঙের ছোট ছোট অসংখ্য উঁচু দাগ দেখা যায়। ঐ দাগ গুলি পাতার উপর পিঠে বিবর্ণ বা খড়ের রঙের হয়। এ রোগে ওযুধ দিতে লাগেনা। মাটি-বাহিত একটি ছত্রাক আক্রমণে নটের ঢলে পড়া রোগও দেখা যায়। পরে ঐ গাছ শুকিয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রেও ওষুধ দেবার প্রয়োজন নেই।

● পটলের ডাঁটা ও ফলপচা ঃ

উচ্ছের তুলো রোগ

শীত কমলেই এই রোগ দেখা যায়। চাষী ভাইরা এটিকে হাজা বলে থাকেন। বর্ষা কালে রোগের প্রকোপ বাড়ে। ডাঁটায় দুটি পর্ব মধ্যের জায়গা পচে যায়। গাছের ডাঁটা ও পাতা শুকিয়ে যায়। পুরো গাছ একসঙ্গে মরে না। ফলে আক্রমণ হলে ফলের কিছুটা জায়গা পচে নরম হয়ে যায় ও পচা জায়গায় ছত্রাকের আস্তরণ দেখা যায়। জমি থেকে আক্রান্ত লতা ও ফল সরিয়ে নিয়ে, জমি থেকে দুরে কোথাও মাটি চাপা দিতে হবে। মাচা বানিয়ে চাষ করলে রোগের প্রকোপ কম হয়। মেটালাক্সিল-মানজেকাজেব গোত্রের ওষুধ প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম, বা তামা ঘটিত ওষুধ লিটারে ৩ গ্রাম হিসাবে স্প্রে করলে রোগ দমন করা যায়। কারবেন্ডাজিম জাতীয় ওষুধ যথা ব্যাভিস্টিন স্প্রে করা উচিত নয়।

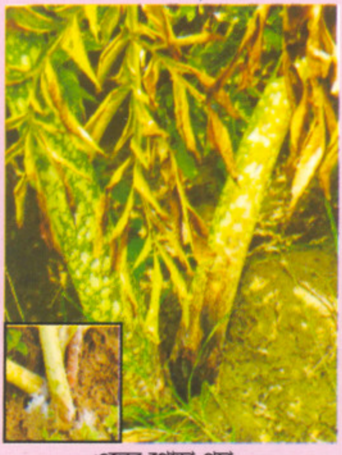

ওলের গোড়া পচা

● ওলের গোড়া পচা ঃ

রোগটি গাছের গোড়াতে দেখা যায়। জমিতে গাছ ভেঙ্গে পড়ছে দেখলেই ধরে নিতে হবে গোড়া পচা হয়েছে। গাছের গোড়ায় সাদা সরষের দানার মতো ছত্রাক দেখা যায়। লক্ষ রাখতে হবে জমিতে জল না দাঁড়ায়। ছত্রাক দানা সহ আক্রান্ত গাছ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। মানকোজেব ৩ গ্রাম প্রতি লিটার হিসাবে একটা বড় পাত্রে একসঙ্গে গুলে ওলের বীজ শোধন করতে হবে। ওলের বীজগুলি ১৫ মিনিট ওই পাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

পরে ছায়ায় শুকিয়ে ওল লাগাতে হবে ওলের কন্দ লাগাবার সময় মূল জমিতে প্রতি গর্তে ট্রাইকোডারমা ও জৈবসারের মিশ্রন দিলে এ রোগের আক্রমনের সম্ভাবনা কম হয়।

○ বহু ফসল ভোজি পোকা ঃ

একই পোকা একাধিক ফসলে আক্রমণ করে। এতে ঐ পোকা ফসলের ক্ষেতে অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়। ফলে প্রতি মরশুমে এসবের পোকা থেকেই যায়। এধরণের একটি পোকা হল **জাবপোকা** ছোট (২-৩ মিমি) আকারের নরম প্রায় গোলাকার। হলুদ বা সবুজ বা কালচে-হলুদ রঙের হয় ফসলের কচি ডগায় বা পাতায় তলার পিঠে ঝাঁক বেঁধে বসে থাকে। খুব কমই নড়াচড়া করে শুঁড়টা পাতা বা ডগার ভিতরে ঢুকিয়ে রস শুষে খায়। এই জাতের পোকা সাধারণত নানা দ্বিবীজপত্রী ফসলে জীবন ধারণ করতে পারে। ফলে যে কোন সময়েই ফসলে আক্রমণ ঘটায় আক্রমণের জায়গা অবশ্য বাড়ন্ত কুঁড়ি, শাখা ও নরম পাতা। চারা গাছের ডগাতে বেশি লাগলে গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। পরিণত গাছের পাতার তলাতে বড় বড় ঝাঁক থাকলে ফলন কমে যায়।

দ্বিতীয়টি হল **লাল মাকড়**। খুবই ছোট। আতস কাঁচে দেখলে সিঁদুরে রঙের গোলাকার এই মাকড়কে চার জোড়া পায়ে হাঁটতে দেখা যায়। আরো ছোট তিন জোড়া পা ওয়ালা টকটকে লাল শাবক এই বিন্দুর মত চেপটা গোল ডিম শিরার পাশে বা দুই শিরার সংযোগস্থলে দেখা যায় ফসলের পরিণত অবস্থায় এরা ব্যপক শোষণ করে। আক্রান্ত পাতা হলদেটে হয়ে যায়।

বহুভোজী দুই কীট শত্রুর নিয়ন্ত্রণে জৈব ফসফরাস-ঘটিত অন্তর্বাহি কীটনাশক - মিথাইল ডেমেটন (১ মি.লি / লিটারে) স্প্রে করতে হয়। শুধু মাকড় থাকলে অবশ্য মাকড় নাশক ওযুধ দেওয়া ভালো।

○ বহু ফসলে আক্রমনকারী রোগজীবাণু ঃ

বহু ডালশস্য, তৈলবীজ, সবজি, ফুল ও বাহারি ফসলে গোড়াপচা (ফুট বা রুট রট) রোগহয়, কয়েকটি ছত্রাকের আক্রমণে। এদের অনেকে এসব ফসলের চারা ধ্বসা রোগেরও কারণ। রোগ জীবানু ছত্রাকগুলির মধ্যে এ অঞ্চলের আবহাওয়াতে রাইজকটনিয়ার দুটি প্রজাতি, পাইথিয়াম ও ফাইটফথোরা অন্যতম। কোথাও কোথাও স্ক্লোরোসিয়াম ও থাকে। এই ছত্রাকগুলির মাটিতে বসবাসেরও ক্ষমতা রয়েছে। অনুকুল পরিস্থিতিতে এরা মাটিতে অথবা আগের ফসলের অবশিষ্টাংশের উপর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। শস্য পর্যায়, মাটির প্রকৃতি ও আর্দ্রতা, অম্ল-ক্ষারত্ব এবং মাটিতে জৈবপদার্থে পরিমানের সঙ্গে এদের বাড়া-কমা নির্ভর করে। এ সমস্ত ছত্রাক মাঠে পরিমানে বেশি হয়ে গেলে, অথবা পূর্ণ পচনপ্রাপ্ত নয় এমন জৈবসারের সঙ্গে মাঠে এসে গেলে রোগের প্রকোপ বাড়ে।

ফসলের শিকড়ে বা গোড়ার কাছে এদের আক্রমন হলে শিকড়, গোড়া বা ডাঁটার গায়ের ছাল কিছুটা পচে যায়। পচা জায়গাটা হয় সরু, কালচে। নখ দিয়ে খুঁড়লে সুস্থ ছালে সবুজ রস বেরোয়। এক্ষেত্রে কালো গুঁড়ো গুঁড়ো পচা ছাল বের হবে। এসব গাছের বাড় থেমে থাকে, পাতা ও গাছের ডগা ঝিমিয়ে যায়। পাইথিয়াম বা ফাইটফথোরার ক্ষেত্রে পচাটা নরম, রসা হয়।

এসব রোগের নিয়ন্ত্রণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে চাষ করা, ফসলচক্রে বিভিন্ন ধরনের ফসল (বিশেষত তন্ডুলজাতীয়) ঢোকানো, একই মাঠে বারবার একই ফসল চাষ না করা, মাটির অম্লক্ষারত্ব সংশোধন করা এবং মাটিতে ভালো পচানো জৈব্যসার ব্যবহার করা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ফসলের গোড়া পরিষ্কার করে থাইরাম বা ডায়থেন এম-৪৫ জাতীয় ওযুধ

লিটারে ২.৫ গ্রাম গুলে গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে। কার্বেন্ডাজিম (লিটারে ১ গ্রাম) ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সূত্র ঃ পার্থসারথি নাথ ও শ্রীকান্ত দাস, বিসিকেভি, মোহনপুর

ফুলের পোকা-মাকড় ও সমাধান

● জিনিয়া ফুলের পোকা-মাকড় ঃ

কালো অথবা জলপাই রঙের এক ধরনের জাবপোকা ফুলের ডাঁটায় এবং বাড়ন্ত নরম পাতার তলার দিকে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। পুর্ণাঙ্গ ও পুত্তলিকা উভয়ই রস শুষে খায়। ফলে পাতা ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। শোষক পোকা অথবা সাদা দইয়ে পোকার আক্রমণেও আগের মত লক্ষণগুলি দেখা যায়। এছাড়াও এক ধরনের পাতা খাওয়া পোকা কচি পাতা এবং ফুলের অংশ খেয়ে গাছের বৃদ্ধি ও ফুলের উৎপাদন কমায়। এসব পোকার নিয়ন্ত্রনের জন্য (১) গাছ আক্রান্ত হচ্ছে কিনা তা জানতে নজরদারি চাই। (২) আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা (৩) জৈব সারের সাথে নিমখোল প্রয়োগ করা (৪) জাব পোকাও শোষক পোকার আক্রমন বেশী হলে অন্তর্বাহী কীটনাশক যেমন ঃ মেটাসিস্টকস জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। (৫) পাতা খাওয়া বা দইয়ে পোকার জন্য কার্বারিল গোত্রীয় ঔষুধ নির্দিষ্ট দিন ব্যবধানে প্রয়োগ করতে হবে।

● জিনিয়া ফুলের রোগ-ব্যাধি ঃ

বীজতলায় ঢলে পড়া এবং শিকড় পচা রোগটি ঠান্ডা এবং আর্দ্র আবহাওয়াতে দেখা যায়। চারাগুলি হালকা হলুদ রঙের হয়। ঝিমিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছের গোড়ার অংশ কালচে রঙের হয়ে পচে যায়। বাড়ন্ত গাছের পাতায় বিভিন্ন রকম ছিট দাগ বা পাতা ও ডগা ঝলসা রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাতায় ছিট দাগের প্রকার ভেদ আছে। কোনো দাগের রং লালচে বাদামী কিনারা যুক্ত সাদা বা ধূসর আবার কিছু ক্ষেত্রে দাগ শুরু হয় লালচে বাদামী রঙ দিয়ে পরে ধুসর হয়ে পাতার অনেকটা অংশে ঝলসার লক্ষণ তৈরী করে। কিছু দাগ আবার আলপিনের মাথার আকারের শুরুতে; পরে এটা বেড়ে হালকা ও সাদাটে রঙের বড় দাগে পরিণত হয় এবং পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। ছত্রাকজনিত আক্রমনে কখনও আবার ফুটন্ত ফুলসহ ডালগুলি শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে যাওয়া ডালগুলির পাতাতেও গাঢ় বাদামী দাগ দেখা যায়। আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেশী হলে জিনিয়া ফুলে সাদা গুঁড়ো চিতি বা পাউডারি মিলডিউ রোগ পাতায়, কান্ডে এবং ফলে সাদা পাউডারের আস্তরণ তৈরী করে। সালোকসংশ্লেষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আগেই গাছ মরে যেতে পারে।

বাদামী ছিট দাগ সাদাগুঁড়ো চিতি

এসব রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণে কতকগুলি পরামর্শ মেনে চলা উচিত :

(১) বীজতলা এবং মূল জমি তৈরীর সময় রোগের উৎস আগাছা পরিস্কার করা। (২) নীরোগ বীজ সংগ্রহ করা এবং থাইরাম (২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ) অথবা কাপটান (২ গ্রাঃ / প্রতি কেজি) দিয়ে বীজ শোধন করা। (৩) বীজতলায় সারিতে বীজ ফেলা এবং সঠিক সংখ্যক চারা রাখা। (৪) বীজতলায় যথেষ্ট জৈবসার প্রয়োগ। (৫) মূল জমিতে জৈবসারের সাথে

ট্রাইকোডারমা প্রয়োগ। (৬) ঢলে পড়া রোগের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক মেটালক্সিল-মানকোজেব গ্রাম বা তামাঘটিত ওষুধ ৩ গ্রাম লিটার প্রতি জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। (৭) গোড়া শিকড় প রোগের জন্য প্রয়োজন কার্বেন্ডাজিম-মানকোজেব (১ গ্রা-২ গ্রাঃ) হিসাবে বা ভালিডামাইসি প্রয়োগ করা যেতে পারে। (৮) পাতার দাগ, ঝলসা, ডাল শুকিয়ে যাওয়া রোগ নিয়ন্ত্র মানকোজেব ৪৫ (২ গ্রা) বা প্রপিকোনাজল (১ গ্রাম) বা তামঘটিত (৩ গ্রাম) প্রতি লিটার জ গুলে স্প্রে করা দরকার। (৯) সাদা গুড়ো চিতি রোগ দমনে জলে দ্রবণীয় সালফার (২গ্রা) ট্রায়াডিমেফন (১ গ্রাম) লিটারে প্রতি জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

● দোপাটির পোকা-মাকড় ঃ

নীলচে কালো ছিটযুক্ত লাল এবং সম্পূর্ণ কালো দুরকম শক্ত পোকার শুককীট দোপাটি গা পাতা খেয়ে কঙ্কালসার করে দেয়। পরে পাতার বোঁটার অংশ দিয়ে কান্ডে প্রবেশ করে। এ গাছের বৃদ্ধি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। চাষী সঠিক ফলন পায় না। পুর্ণাঙ্গ পোকা গাছের গোড়া দিকে ডিম পাড়ে এবং একমাসের মধ্যে শুককীট মাটিতে বেরিয়ে আসে। এছাড়াও পাতাকা পোকার শুককীট গাছে পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশ খেয়ে গাছকে দুর্বল করে দেয়। এসব পোক নিয়ন্ত্রণের জন্য মাটিতে গভীর ভাবে চাষ দিয়ে যথেষ্ট সূর্যের আলো খাওয়ালে আক্রমণ কমে মূলজমিতে জৈবসার বিশেষত নিমখোল প্রয়োগে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

বাগিচায় পোকামাকড়ের উপস্থিতি ও তীব্রতার দিকে নজরদারি করতে হবে। গোড়ার দিক আক্রমণ অল্প হলে পোকার শুককীট হাত দিয়ে তুলে মেরে ফেলতে হবে। এরপর আক্রমণে তীব্রতা বুঝে প্রয়োজনমত কার্বারিল ১০ শতাংশ পাউডার ছড়ানো, বা এন্ডোসালফান ৩৫ ই.সি মিলি বা কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

● দোপাটির রোগ ঃ

জিনিয়া ফুলের মত দোপাটিতেও ঢলে পড়া ও গোড়া বা শিকড় পচা রোগ হয়। এছাড়াও সাদা গুঁড়োচিতি রোগ ও পাতার দাগ আর্দ্র আবহাওয়াতে দেখা যায়। পরিচর্যা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জিনিয়ার মতনই। এছাড়াও আর্দ্র ও একটু ঠান্ডাতে বিশেষত বর্ষায় পাতায় হলদে ছোপ ধরে। পরে আকারে বাড়ে। ছোপযুক্ত পাতার নীচের অংশে সাদা তুলোর মত ছত্রাক দেখা যায়। তাই একে তুলো রোগ বা ডাউনি মিলডিউ বলে। প আক্রান্ত পাতাগুলি ঝলসে যায়। গাছ মরেও যায়। রোগ মোকাবিলার জন্য জল দেওয়া নিয়ন্ত্র করে গাছের ঘনত্ব কমাতে হবে। আগাছা ও রোগাক্রান্ত গাছ পরিস্কার করে ফেলতে হবে ছত্রাকনাশক মেটালাক্সিল-ম্যানকোজেব ২ গ্রাম বা তামাঘটিত ওষুধ ৩ গ্রাম পতি লিটার জ গুলে স্প্রে করতে হবে।

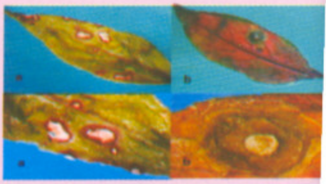
ছত্রাকজনিত পাতার দাগ

সূত্র ঃ সুজিত কুমার রায়, সুব্রত দত্ত ও মনোজ ঘোষ, বিসিকেভি, মোহনপুর

● রজনীগন্ধা ফুলের কৃমিরোগ ঃ

রোগ লক্ষণ ঃ কৃমিটি প্রাথমিকভাবে ফুলগাছের পাতায় ছোপ ছোপ দাগ সৃষ্টি করে। কান্ডটি ক থেকে বেরোনোর পরে কান্ডের গায়ে উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো অমসৃণ ভাব লক্ষ্য করা যায়। কান্ড বেঁটে, কোঁকড়ানো বা পাকানো হতে থাকে। আক্রমণের তীব্রতা খুব বেশি হলে কান্ডটিতে কে ফুল ধরে না। যদিও বা ফুল ধরে তবে ফুলগুলো কোঁকড়ানো, ছোট এবং খুবই কম সংখ্য

কৃমি আক্রান্ত ফুল

কখনো কখনো ডগার দিকে একটা দুটো ফুল ফোটে। কিন্তু পুরো মঞ্জরী দন্ডটি আকারে খুব ছোট হয় এবং বিকৃত আকার ধারণ করে। ফুলের বৃন্তাংশটির গোড়ার দিকে গাঢ় বাদামি রঙের ক্ষতের মত দাগ দেখা যায়। ফুলের পাপড়ির উপর ঘন হলদে থেকে বাদামি রঙের ছোপ ছোপ দাগ হয়। ফুলের অভ্যন্তরে গর্ভাশয়ে অসংখ্য কৃমি গিজগিজ করে। ফুলের ক্ষতের মত দাগ থেকে জটপাকানো অসংখ্য কৃমি উলের মত গুটি পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। এরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কুন্ডলী পাকিয়ে শুষ্ক পাতায় বা মঞ্জরীদন্ডে বেশ কয়েক মাস বেঁচে থাকতে পারে। তবে এরা মাটিতে বেশিদিন বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় না। একটি ফুলের মঞ্জরীদন্ড থেকে প্রায় ৫০,০০০ কৃমি পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা ডাবল জাতের ক্ষেত্রে আরও বেশি হতে পারে, বিশেষ করে বর্ষা ঋতুতে যখন বাতাসের আর্দ্রতা খুব বেশি থাকে।

রোগের বিস্তার ঃ এই রোগের বিস্তার নানাভাবে হতে পারে। রজনীগন্ধার ক্ষেত্রে প্রধানত আক্রান্ত কন্দ থেকে এই রোগের উৎপত্তি। কন্দের গায়ে শুকনো আঁশ বা শল্কপত্র থাকে, তার খাঁজে কৃমিগুলো বিশেষ উষর অবস্থায় সুপ্ত থাকে। ধানের জমির পাশে রজনীগন্ধা চাষ করলে ঝরে পড়া আক্রান্ত বীজ থেকে কৃমিগুলো সতেজ হয়ে জলের মাধ্যমে নালাবাহিত হয়ে অন্য জমিতে ঢুকে পড়ে। আক্রান্ত মঞ্জরী দন্ডটি শুকিয়ে মাটিতে পড়ে থাকাকালীন অবস্থাতেও অপূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ কৃমিগুলো কুন্ডলী পাকিয়ে সুপ্ত অবস্থায় কয়েক মাস বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং আক্রান্ত গাছের অবশিষ্টাংশগুলো বাতাসে বা অন্য কোনভাবে ছড়িয়ে পড়লে কৃমি বাহিত হয়। একই কৃমি ধানে সাদা ডগা রোগ সৃষ্টি করে। ধানের তুষ এবং চালের মাঝে সুপ্ত অবস্থায় কৃমিটি নিক্রিয় হলে কুন্ডলী পাকিয়ে দুবছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। আক্রান্ত বীজের মাধ্যমে এদের সংক্রমণ হয়, তবে সেচের জলের মাধ্যমেও দ্রুত অন্য জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই কৃমিটির জীবন-চক্র খুবই দ্রুত সম্পন্ন হয়। সম্পূর্ণ হতে মাত্র ১১ থেকে ১৩ দিন সময় লাগে।

রজনীগন্ধার কৃমি

প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ এই কৃমিটি দমন করা কঠিন। কারণ এদের বিস্তার ধানের বীজ, রজনীগন্ধার কন্দ এবং সেচের জলের মাধ্যমে হয়। তাছাড়া এরা নিক্রিয়ভাবে কুন্ডলী পাকিয়ে বিশেষ প্রতিরোধক ব্যবস্থায় ২৫ মাসের বেশি বেঁচে থাকতে পারে। এদের আক্রমণের তীব্রতা কমাতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ঃ

১. কৃমিমুক্ত কন্দ লাগাতে হবে। কন্দগুলো লাগানোর আগে সারারাত্রি জলে ভিজিয়ে রাখার পর কৃমিনাশক ওষুধ মনোক্রটোফস (প্রতি লিটার জলে ২ মিলি হিসাবে) একটানা ছঘন্টা ডুবিয়ে শোধন করতে হবে।

২. কন্দ থেকে গাছ বেরোনোর পর থেকে ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর তিন থেকে চারবার প্রতি লিটার জলে ২ মিলি মনোক্রটোফস স্প্রে করতে হবে।

৩. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর একই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র এপ্রিল-মে মাস থেকে স্প্রে চালিয়ে যেতে হবে। রজনীগন্ধা ফুলের জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং আক্রান্ত কান্ড ও মঞ্জরীদন্ডগুলো তুলে অবশ্যই পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে হবে।

৪. ধানের জমি থেকে রজনীগন্ধার জমিতে জল ঢোকা বন্ধ করতে হবে।

৫. পরপর দু বছর রজীগন্ধার ফুল পাওযার পরই জমি ভেঙে ফেলতে হবে।

সূত্র ঃ এম. আর. খান, বিসিকেভি, মোহনপুর

লালসংকেত

● **আলুর মারণরোগ ঃ** উদয়নারায়নপুর, হাওড়া, মেমারি বর্ধমানে হুগলীর ধনেখালি, হরিপাল, পুরশুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে আলুর নাবি ধ্বসা রোগ মহামারি আকারে দেখা গেল। ২৪ পরগণাতেও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফাইটফথোরা ছত্রাকজনিত কারণে এ রোগ। আসলে এবার দু-তিন সপ্তাহ অত্যাধিক ঠান্ডা পড়েছিল। তারপর হঠাৎ কুয়াশা মেঘলা। বেশ ঠান্ডার পর হঠাৎ কুয়াশা, গরম এসবই নাবিধ্বসা রোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। লক্ষণ যা ফোনে চাষীর কাছে শোনা গেল - পাতা কালো হয়ে পচে যাওয়া, নীচে নেমে বোঁটা, ডাঁটা সবই কালো, ভেজা ভেজা, নরম পচা - এ রোগেরই লক্ষণ। ওষুধে কাজ হচ্ছে না বলছেন। এমনটা তো হওয়ার নয়। অ্যালকিলিন বিসডায়থায়োকার্বামেট গোষ্ঠীর ইন্দোফিল-৪৫, ডায়থেন এম-৪৫ জাতীয় ওষুধ লিটারে ২.৫ গ্রাম গুলে ভালোকরে সবপাতা ভিজিয়ে স্প্রে করলে কাজ হবেই। পাঁচ-সাতদিনে বার দুয়েক স্প্রে করতে হয়। মাঠে নিয়মিত নজরদারি থাকলে, দু-একটা গাছে রোগ লাগলেই এবং প্রথম কুয়াশা দেখেই স্প্রে করতে হত। বাইরে থেকে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার। মূল জমিতে উপরোক্ত ঔষুধে কাজ না হলে সাইমস্কালিন -মানকোজেব লিটারে ৩ গ্রাম গুলে স্প্রে করতে হবে।

সূত্র ঃ এ.এ.পি.পি- রিপোর্ট, ২০০৭

শস্য সুরক্ষার প্রযুক্তি ঃ চাষী কতটা নিচ্ছেন

সাধারণত যা শুনি, দেখিও আশপাশে তাতে কিছু কিছু চাষী ফসলে রোগ পোকা লাগলে বা আশানুরূপ বাড় না হলে, বা মড়ক লাগলে কাছে বা অনেক দূরে হলেও ছুটে আসেন। যে কোনভাবে ফসলটা বাঁচাতে হবে। চাষীর হিসাবটা ঠিক আছে। ফুল আসা বা ফল ধরার সময় যে বেগুনটা ঢলে পড়ছে তাকে কোনমতে আর একমাস বাঁচিয়ে রাখতে পারলে খরচ উঠে লাভ হবে। এসময় যে যা বলেন -সব ওষুধই প্রয়োগ করে বসেন, একটার পর একটা। এরপর হয়ত বিশেষজ্ঞ বললেন - না এ রোগের আক্রান্ত ফসলে দেবার ওষুধ নেই। আগামী বছর থেকে করণীয় গুলি তিনি বলেন। চাষী সন্তুষ্ট হন না। অথচ উত্তর প্রদেশের গাজিপুর ও সুলতানপুরে ক্রপিং সিসটেম রিসার্চ প্রকল্পের ধান ও গমের ২০০৩ -০৪ এর কাজে দেখা গেল মাত্র ২৯.৬০% ও ৪২.৪৯% আগাছা দমনের প্রযুক্তি এবং ৩৫.৮৩% রোগপোকা দমনের প্রযুক্তি চাষী নিয়েছেন। গমের ক্ষেত্রে এটা যথাক্রমে ২৯.৬০%। দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে ধানের আগাছার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নেওয়ার হার কম (১৩.৩৩%)। রোগপোকা দমনের জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ আরো কম (১০%)। বড় চাষীদের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি। ৫০.০ ও ৬২.০%। এর পিছনে অর্থনৈতিক কারণটাই প্রধান কি না সেটা জানা দরকার। কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

সূত্র ঃ প্রজেক্ট ডাইরেক্টরেট, ক্রপিং সিস্টেম রিসার্চ, ২০০৩-২০০৪ বার্ষিক রিপোর্ট।

গাছের রোগের ডাক্তারি

মদনপুরের এক ডিলার ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ বড় একটা বেগুন ক্ষেতে ফুল আসছে তখন। অনেক গাছে ওপরের দিকের ডাল ঝিমিয়ে পড়ছে। উনি ডগা ভেঙ্গে পোকা পাননি কোন। তবু কীটনাশক স্প্রে করেছেন যথেষ্ট। কাজ হয়নি। একটা দুটো গাছে ডাল থেকেই সমস্যাটা বোঝা গেল। তখন এ রোগটা অত পরিচিত ছিল না। ওঁকে বললাম -ওষুধটা বদলান। কার্বেন্ডাজিম ও তামাঘটিত ছত্রাকনাশক ওনার দোকানেই ছিল। বললাম লিটারে ১ গ্রাম হিসাবে কার্বেন্ডাজিম বা তামাঘটিত ওষুধ গুলে স্প্রে করুন ৩ গ্রাম হিসাবে। তার আগে ওনাকে চেনালাম রোগের লক্ষণটি। ডগা থেকে একুট নীচে ডালের দেড়-ইঞ্চি দু-ইঞ্চি ছাল ছাইরঙা হয়ে শুকনো পচা ধরেছে। জায়গাটা একটু সরু হয়ে গেছে। তার ফলে ডালের ডগা ঝিমিয়ে পড়ছে। ছত্রাক ফোমপ্‌সিস্‌ এরোগের কারণ। যতটা সম্ভ ব আক্রান্ত ডাল পচা অংশের তলা পর্যন্ত ছেঁটে নিয়ে মাঠের বাইরে ফেলতে হয়। তারপর ওষুধ ছেটানো। দু-সপ্তাহ বাদে ফোনে জানালেন বেগুন পুরোদমে ফলন দিচ্ছে। দু-বার স্প্রে করাতেই কাজ হল।

Registered under W.B. Act XXVI of 19
Registration No. S/1L37974/2006-07,Kolk

আপনি কি :

- ফসলের কোনো নতুন সমস্যা দেখছেন ?
- কোনো রোগ - পোকা কি অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে ?
- ফলন কি কম হচ্ছে ?
- অন্য কোন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ?
- শস্য সুরক্ষায় নতুন কোনো তথ্য চান ?

তা'হলে এ এ পি পি র সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

-: যোগাযোগের সময় :-

সমাধানের জন্য, চিঠি লিখে বা নিজে এসে যোগাযোগ করুন
প্রতি শুক্রবার সকাল ১১: ০০ থেকে ১২: ৩০ এর মধ্যে
(ছুটির দিন বাদে)

অথবা

ফোনে প্রতি রবিবার
(ড. শ্রীকান্ত দাস ০৯৪৩৩২৮৫১১৫,
ড. মতিয়ার রহমান খান ০৯৪৩৩৩৬২২৯৩)

ঠিকানা : ড. শান্তনু ঝা, সচিব, এ এ পি পি,
প্লান্ট প্রোটেকশন ইউনিট, বি সি কে ভি,
মোহনপুর, নদীয়া ৭৪১২৫২
দুরভাষ: ০৯৪৩৩০১১৫২৯
ফ্যাক্স: ০৩৩-২৫৮২৮৬৩০